আল হাক্কাহ

৬৯

নামকরণ

সূরার প্রথম শব্দটিকেই এর নাম হিসেবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এ সূরাটিও মক্কী জীবনের প্রাথমিক যুগে অবতীর্ণ সূরাসমূহের একটি। এর বিষয়বস্তু থেকে বুঝা যায়, সূরাটি যে সময় নাযিল হয়েছিলো তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতা শুরু হয়েছিলো ঠিকই কিন্তু তখনো তা তেমন তীব্র হয়ে ওঠেনি। মুসনাদে আহমাদ হাদীস গ্রন্থে হযরত উমর (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন ঃ ইসলাম গ্রহণের পূর্বে একদিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যে আমি বাড়ি থেকে বের হলাম। কিন্তু আমার আগেই তিনি মসজিদে হারামে পৌঁছে গিয়েছিলেন। আমি সেখানে পৌঁছে দেখলাম তিনি নামাযে সূরা আল হাক্কাহ পড়ছেন। আমি তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে গেলাম, শুনতে থাকলাম। কুরআনের বাচনভঙ্গি আমাকে বিস্ময়ে অভিভূত করে ফেলেছিল। সহসা আমার মন বলে উঠলো, লোকটি নিশ্চয়ই কবি হবে। কুরাইশরাও তো তাই বলে। সে মুহূর্তেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখে একথাগুলো উচ্চারিত হলো ঃ "এ একজন সম্মানিত রসূলের বাণী। কোন কবির কাব্য নয়।" আমি মনে মনে বললাম ঃ কবি না হলে গণক হবেন। তখনই পবিত্র মুখে উচ্চারিত হলো ঃ "এ কোন গণকের কথাও নয়। তোমরা খুব কমই চিন্তা–ভাবনা করে থাকো। একথা তো বিশ্ব–জাহানের রব বা পালনকর্তার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত।" এসব কথা শোনার পর ইসলাম আমার মনের গভীরে প্রভাব বিস্তার করে বসলো। হযরত উমরের (রা) এ বর্ণনা থেকে জানা যায়, সূরাটি তাঁর ইসলাম গ্রহণের অনেক আগে নাযিল হয়েছিলো। কারণ এ ঘটনার পর বেশ কিছুকাল পর্যন্ত তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি। তবে বিভিন্ন সময়ের কিছু ঘটনা তাঁকে ক্রমান্বয়ে ইসলামের প্রতি আগ্রহী করে তুলছিলো। অবশেষে তাঁর মনের ওপর চূড়ান্ত আঘাত পড়ে তাঁর আপন বোনের বাড়ীতে। আর এ ঘটনাই তাঁকে ঈমানের মনযিলে পৌঁছিয়ে দেয়। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা মারয়ামের ভূমিকা; সূরা ওয়াকিয়ার ভূমিকা)

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

সূরাটির প্রথম রুকূ'তে আখেরাত সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। আর দ্বিতীয় রুকূ'তে কুরআনের আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হওয়া এবং হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে, আল্লাহর রসূল তার সত্যতা সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে।

কিয়ামত ও আখেরাতের কথা দিয়ে প্রথম রুকূ' শুরু হয়েছে। কিয়ামত ও আখেরাত এমন একটি সত্য যা অবশ্যই সংঘটিত হবে। আয়াত ৪ থেকে ১২তে বলা হয়েছে যে, যেসব জাতি আখেরাত অস্বীকার করেছে শেষ পর্যন্ত তারা আল্লাহর আযাবের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়েছে। অতপর ১৭ আয়াত পর্যন্ত কিয়ামত কিভাবে সংঘটিত হবে তার চিত্র পেশ করা হয়েছে। যে উদ্দেশ্যে মহান আল্লাহ দুনিয়ার বর্তমান জীবন শেষ হওয়ার পর মানুষের জন্য আরেকটি জীবনের ব্যবস্থা করেছেন ১৮ থেকে ২৭ আয়াতে সে মূল উদ্দেশ্যটি বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, সেদিন সব মানুষ তার রবের আদালতে হাজির হবে। সেখানে তাদের কোন বিষয়ই গোপন থাকবে না। প্রত্যেকের আমলনামা তার নিজের হাতে দিয়ে দেয়া হবে। পৃথিবীতে যারা এ উপলব্ধি ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে জীবন যাপন করেছিলো যে, একদিন তাদেরকে আল্লাহর কাছে নিজ নিজ কাজের হিসেব দিতে হবে, যারা দুনিয়ার জীবনে নেকী ও কল্যাণের কাজ করে আখেরাতে কল্যাণলাভের জন্য অগ্রীম ব্যবস্থা করে রেখেছিলো তারা সেদিন নিজের হিসেব পরিষ্কার ও নিরঝঞ্ঝাট দেখে আনন্দিত হবে। পক্ষান্তরে যেসব লোক আল্লাহ তা'আলার হকেরও পরোয়া করেনি, বান্দার হকও আদায় করেনি, তাদেরকে আল্লাহর পাকড়াও থেকে রক্ষা করার মত কেউ থাকবে না। তারা জাহান্নামের আযাব ভোগ করতে থাকবে।

দ্বিতীয় রুকূ'তে মক্কার কাফেরদেরকে বলা হয়েছে। এ কুরআনকে তোমরা কবির কাব্য ও গণকের গণনা বলে আখ্যায়িত করছো। অথচ তা আল্লাহর নাযিলকৃত বাণী। তা উচ্চারিত হচ্ছে একজন সম্মানিত রসূলের মুখ থেকে। এ বাণীর মধ্যে নিজের পক্ষ থেকে একটি শব্দও হ্রাস বা বৃদ্ধি করার ইখতিয়ার রসূলের নেই। তিনি যদি এর মধ্যে তাঁর মনগড়া কোন কথা শামিল করে দেন তাহলে আমি তার ঘাড়ের শিরা (অথবা হৃদপিণ্ডের শিরা) কেটে দেবো। এ একটি নিশ্চিত সত্য বাণী। যারাই এ বাণীকে মিথ্যা বলবে শেষ পর্যন্ত তাদের অনুশোচনা করতে হবে।

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

اَلْحَآقَّةُ ۝١ مَا الْحَآقَّةُ ۝٢ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْحَآقَّةُ ۝٣ كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ وَعَادٌۢ بِالْقَارِعَةِ ۝٤ فَاَمَّا ثَمُوْدُ فَاُهْلِكُوْا بِالطَّاغِيَةِ ۝٥ وَاَمَّا عَادٌ فَاُهْلِكُوْا بِرِيْحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ۝٦ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَّثَمٰنِيَةَ اَيَّامٍ ۙ حُسُوْمًا ۙ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيْهَا صَرْعٰى ۙ كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ۝٧ فَهَلْ تَرٰى لَهُمْ مِّنْ بَاقِيَةٍ ۝٨ وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهٗ وَالْمُؤْتَفِكٰتُ بِالْخَاطِئَةِ ۝٩ فَعَصَوْا رَسُوْلَ رَبِّهِمْ فَاَخَذَهُمْ اَخْذَةً رَّابِيَةً ۝١٠

অবশ্যম্ভাবী ঘটনাটি[১]। কি সে অবশ্যম্ভাবী ঘটনাটি? তুমি কি জান সে অবশ্যম্ভাবী ঘটনাটি কি?[২] সামূদ[৩] ও আদ আকস্মিকভাবে সংঘটিতব্য সে মহা ঘটনাকে[৪] অস্বীকার করেছিলো তাই সামূদকে একটি কঠিন মহা বিপদ[৫] দিয়ে ধ্বংস করা হয়েছে। আর আদকে কঠিন ঝঞ্ঝাবাত্যা দিয়ে ধ্বংস করা হয়েছে। যা তিনি সাত রাত ও আট দিন ধরে বিরামহীনভাবে তাদের ওপর চাপিয়ে রেখেছিলেন। (তুমি সেখানে থাকলে) দেখতে পেতে তারা ভূলুন্ঠিত হয়ে পড়ে আছে। যেন খেজুরের পুরনো কাণ্ড। তুমি তাদের কাউকে অবশিষ্ট দেখতে পাচ্ছো কি? ফেরাউন, তার পূর্ববর্তী লোকেরা এবং উলটপালট হয়ে যাওয়া জনপদসমূহও[৬] একই মহা অপরাধে অপরাধী হয়েছিলো। তারা সবাই তাদের রবের প্রেরিত রসূলের কথা অমান্য করেছিল। তাই তিনি তাদের অত্যন্ত কঠোরভাবে পাকড়াও করেছিলেন।

১. মূল আয়াতে اَلْحَآقَّةُ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ এমন ঘটনা যা অবশ্যই সংঘটিত হবে। যার সংঘটিত হওয়া একান্ত বাস্তব, যার সংঘটিত হওয়ায় কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। কিয়ামতের জন্য এ ধরনের শব্দ ব্যবহার এবং তা দিয়ে বক্তব্য শুরু করা প্রমাণ করে যে, এ বক্তব্য এমন লোকদের উদ্দেশ করে পেশ করা হয়েছে যারা

إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ ﴿١١﴾ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ
وَاعِيَةٌ ﴿١٢﴾ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ﴿١٣﴾ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ
فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ﴿١٤﴾ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴿١٥﴾ وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ
يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ ﴿١٦﴾ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا ۚ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ
يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ ﴿١٧﴾ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ﴿١٨﴾

যে সময় পানির তুফান সীমা অতিক্রম করলো[৭] তখন আমি তোমাদেরকে জাহাজে সওয়ার করিয়েছিলাম[৮] যাতে এ ঘটনাকে আমি তোমাদের জন্য একটি শিক্ষণীয় স্মৃতি বানিয়ে দেই যেন স্মরণকারী কান তা সংরক্ষণ করে[৯]।

অতপর[১০] যে সময় শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে—একটি মাত্র ফুৎকার। আর পাহাড়সহ পৃথিবীকে উঠিয়ে একটি আঘাতেই চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়া হবে। সেদিন সে মহা ঘটনা সংঘটিত হয়ে যাবে। সেদিন আসমান চৌচির হয়ে যাবে এবং তার বন্ধন শিথিল হয়ে পড়বে। ফেরেশতারা এর প্রান্ত সীমায় অবস্থান করবে। সেদিন আটজন ফেরেশতা তাদের ওপরে তোমার রবের আরশ বহন করবে।[১১] সেদিনটিতে তোমাদেরকে পেশ করা হবে। তোমাদের কোন গোপনীয় বিষয়ই আর সেদিন গোপন থাকবে না।

কিয়ামতের আগমনকে অস্বীকার করছিলো। তাদেরকে সম্বোধন করে বলা হচ্ছে, যে বিষয়কে তোমরা অস্বীকার করছো তা অবশ্যম্ভাবী। তোমরা অস্বীকার করলেই তার আগমন ঠেকে থাকবে না।

২. শ্রোতাদেরকে সজাগ ও সতর্ক করে দেয়ার জন্য পরপর দু'টি প্রশ্ন করা হয়েছে। যাতে তারা বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করে এবং পূর্ণ মনোযোগ সহকারে পরবর্তী বক্তব্য শ্রবণ করে।

৩. মক্কার কাফেররা যেহেতু কিয়ামতকে অস্বীকার করছিলো এবং তা সংঘটিত হওয়ার বিষয়টিকে একটি তামাশা বলে মনে করছিলো, তাই প্রথমে তাদেরকে এ মর্মে সাবধান করা হয়েছে যে, কিয়ামত একটি অবশ্যম্ভাবী ঘটনা। তোমরা বিশ্বাস করো আর নাই করো তা অবশ্যই সংঘটিত হবে। একথা বলার পর তাদের বলা হচ্ছে, এ বিষয়টি এতটা সাদামাটা বিষয় নয় যে, কেউ একটি সম্ভাব্য ঘটনার খবরকে মেনে নিচ্ছে কিংবা মেনে নিচ্ছে না। বরং জাতিসমূহের নৈতিক চরিত্র এবং তাদের ভবিষ্যতের সাথে এর অত্যন্ত গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। তোমাদের পূর্বের জাতিগুলোর ইতিহাস সাক্ষ দেয়, যে

জাতিই আখেরাতকে অস্বীকার করেছে এবং এ দুনিয়ার জীবনকে প্রকৃত জীবন বলে মনে করেছে পরিশেষে আল্লাহর আদালতে হাজির হয়ে নিজের কৃতকর্মের হিসেব দেয়ার বিষয়টি মিথ্যা বলে মনে করেছে সেসব জাতিই মারাত্মক নৈতিক বিপর্যয়ের মধ্যে পতিত হয়েছে। অবশেষে আল্লাহর আযাব এসে তাদের অস্তিত্ব থেকে দুনিয়াকে পবিত্র করে দিয়েছে।

৪. মূল শব্দ হলো الْقَارِعَة । قرع শব্দটি আরবী ভাষায় খট্‌খট্‌ শব্দ করা, হাতুড়ি পিটিয়ে শব্দ করা, কড়া নেড়ে শব্দ করা এবং একটি জিনিসকে আরেকটি জিনিস দিয়ে আঘাত করা বুঝাতে ব্যবহৃত হয়। কিয়ামতের ভয়াবহতা সম্পর্কে ধারণা দেয়ার জন্য এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

৫. সূরা আ'রাফের ৭৮ আয়াতে এক الرَّجْفَة (প্রচণ্ড ভূমিকম্প) বলা হয়েছে। সূরা হূদের ৬৭ আয়াতে এ জন্য الصَّيْحَة (প্রচণ্ড বিস্ফোরণ) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। সূরা হা–মীম আস্ সাজদার ১৭ আয়াতে বলা হয়েছে যে, তাদেরকে صَاعِقَةُ الْعَذَابِ (আযাবের বজ্র ধ্বনি) এসে পাকড়াও করলো। এখানে সে একই আযাবকে الطَّاغِيَة (অতিশয় কঠিন দুর্ঘটনা) বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এটি একই ঘটনার বিভিন্ন অবস্থার বর্ণনা মাত্র।

৬. অর্থাৎ লূতের কওমের জনবসতিসমূহ। এসব জনবসতি সম্পর্কে সূরা হূদ (৮২ আয়াত) এবং সূরা হিজরে (৭৪ আয়াত) বলা হয়েছে, আমি ঐগুলোকে ওলটপালট করে দিলাম।

৭. নূহের সময়ের মহা প্লাবনের কথা বলা হয়েছে। এ মহা প্লাবনে গোটা একটা জাতিকে এ একই মহা অপরাধের কারণে ডুবিয়ে ধ্বংস করা হয়েছিল। শুধু তারাই বেঁচে ছিল যারা আল্লাহর রসূলের কথা মেনে নিয়েছিলো।

৮. যেসব লোককে জাহাজে উঠিয়ে নেয়া হয়েছিলো তারা হাজার হাজার বছর পূর্বে অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে। পরবর্তীকালের গোটা মানব গোষ্ঠী যেহেতু এ মহা প্লাবন থেকে রক্ষা পাওয়া লোকদের সন্তান–সন্ততি, তাই বলা হয়েছে ঃ আমি তোমাদেরকে জাহাজে উঠিয়ে নিয়েছিলাম। অর্থাৎ আজ তোমরা পৃথিবীতে এ কারণে বিচরণ করতে পারছো যে, মহান আল্লাহ ঐ মহা প্লাবন দ্বারা শুধু কাফেরদের ডুবিয়ে মেরেছিলেন এবং ঈমানদারদের তা থেকে রক্ষা করেছিলেন।

৯. অর্থাৎ এমন কান নয় যা শুনেও শোনে না এবং যে কানের পর্দা স্পর্শ করেই শব্দ অন্যত্র সরে যায়। বরং এমন কান যা শোনে এবং কথাকে মনের গভীরে প্রবিষ্ট করিয়ে দেয়। বাহ্যত এখানে কান শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু অর্থ হলো শ্রবণকারী মানুষ যারা এ ঘটনা শুনে তা মনে রাখে, তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে অতপর আখেরাতকে অস্বীকার এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার পরিণাম কত ভয়াবহ তা কখনো ভুলে যায় না।

১০. পরবর্তী আয়াত পড়ার সময় এ বিষয়টি দৃষ্টিতে থাকা দরকার যে, কিয়ামতের তিনটি পর্যায় আছে। এ তিনটি পর্যায়ের ঘটনাবলী একের পর এক বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত

হবে। কুরআন মজীদের কোন কোন জায়গায় এ তিনটি পর্যায় আলাদাভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আবার কোন কোন জায়গায় প্রথম পর্যায় থেকে শেষ পর্যায় পর্যন্ত একসাথে বর্ণনা করা হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে সূরা নামলের ৮৭নং আয়াতের উল্লেখ করা যায়। এ আয়াতটিতে প্রথমবার শিংগায় ফুৎকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যখন সারা পৃথিবীর মানুষ একটি ভয়ানক বিকট শব্দে এক সাথে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে। সেই সময় গোটা বিশ্ব–জাহানের লণ্ডভণ্ড হয়ে যাওয়ার যে অবস্থা সূরা হজ্জের ১ ও ২ আয়াতে, সূরা ইয়াসীনের ৪৯ ও ৫০ আয়াতে এবং সূরা তাকবীরের ১ থেকে ৬ পর্যন্ত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে তা তাদের চোখের সামনে ঘটতে থাকবে। সূরা যুমারের ৬৭ থেকে ৭০ আয়াতে শিংগায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় ফুৎকারের কথা বলা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে, একবারের ফুৎকারে সব মানুষ মৃত্যু মুখে পতিত হবে। কিন্তু এরপর আবার শিংগায় ফুৎকার দিলে সব মানুষ জীবিত হয়ে যাবে এবং আল্লাহর আদালতে বিচারের সম্মুখীন হবে। সূরা ত্বা–হার ১০২ থেকে ১১২ আয়াত, সূরা আম্বিয়ার ১০১ থেকে ১০৩ আয়াত, সূরা ইয়াসীনের ৫১ থেকে ৫৩ আয়াত এবং সূরা ক্বাফের ২০ থেকে ২২ আয়াতে শুধু শিংগায় তৃতীয়বারের ফুৎকারের কথা উল্লেখিত হয়েছে। (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা ত্বা–হা, টীকা ৭৮; সূরা হজ্জ, টীকা ১ এবং সূরা ইয়াসীন, টীকা ৪৬ ও ৪৭) কিন্তু কুরআন মজীদের এ জায়গায় এবং অন্য আরো অনেক জায়গায় শিংগায় প্রথম ফুৎকার থেকে শুরু করে মানুষের জান্নাত ও জাহান্নামে প্রবেশ করা পর্যন্ত কিয়ামতের সমস্ত ঘটনাবলী একই সাথে বর্ণনা করা হয়েছে।

১১. এ আয়াতটি 'মুতাশাবেহাত' আয়াত শ্রেণীর অন্তরভুক্ত। এর নির্দিষ্ট কোন অর্থ বলা কঠিন। আরশ কি বস্তু আমরা জানি না। কিয়ামতের দিন আটজন ফেরেশতার আরশ বহন করার ধরন কি হবে তাও আমরা বুঝি না। তবে কোন অবস্থায়ই এ ধারণা করা যাবে না যে, আল্লাহ তা'আলা আরশের ওপর উপবিষ্ট থাকবেন আর আটজন ফেরেশতা তাঁকে সহ আরশ বহন করবে। সেই সময় আল্লাহ আরশের ওপর উপবিষ্ট থাকবেন, এমন কথা আয়াতেও বলা হয়নি। মহান আল্লাহ দেহসত্তাহীন এবং দিক ও স্থানের গণ্ডি থেকে মুক্ত। এমন এক সত্তা কোন স্থানে অধিষ্ঠিত থাকবেন আর কোন মাখলুক তাকে বহন করবে এটা ভাবা যায় না। আল্লাহর মহান সত্তা সম্পর্কে কুরআন মজীদের দেয়া ধারণা আমাদেরকে এরূপ কল্পনা করতে বাধা দেয়। এ জন্য খুঁজে খুঁজে এর অর্থ বের করার প্রচেষ্টা চালানো নিজেকে গোমরাহী ও বিভ্রান্তির গহবরে নিক্ষেপ করার শামিল। তবে এ বিষয়টি বুঝা দরকার যে, আল্লাহ তা'আলার শাসন ও শাসন কর্তৃত্ব এবং তাঁর যাবতীয় বিষয়ের একটা ধারণা দেয়ার জন্য কুরআন মজীদে আমাদের জন্য এমন একটি চিত্র পেশ করা হয়েছে যা দুনিয়ার কোন বাদশার বাদশাহীর চিত্রের অনুরূপ। মানুষের ভাষায় রাষ্ট্র ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির জন্য যে পরিভাষা ব্যবহার করা হয় এ জন্য অনুরূপ পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ, মানুষের বুদ্ধি–বিবেক এরূপ চিত্র এবং পরিভাষার সাহায্যেই গোটা বিশ্ব–সাম্রাজ্যের বিভিন্ন বিষয় কিছুটা উপলব্ধি করতে সক্ষম। বিশ্ব–জাহানের ইলাহী ব্যবস্থাপনাকে মানুষের বোধগম্যতার সীমায় নিয়ে আসাই এ ধরনের বর্ণনাভঙ্গী গ্রহণের উদ্দেশ্য। তাই এর আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ করা ঠিক নয়।

فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَٰبَهُۥ بِيَمِينِهِۦ فَيَقُولُ هَآؤُمُ ٱقْرَءُوا۟ كِتَٰبِيَهْ ﴿١٩﴾ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَٰقٍ حِسَابِيَهْ ﴿٢٠﴾ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴿٢١﴾ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿٢٢﴾ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴿٢٣﴾ كُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ هَنِيٓـًٔۢا بِمَآ أَسْلَفْتُمْ فِي ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَالِيَةِ ﴿٢٤﴾ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَٰبَهُۥ بِشِمَالِهِۦ فَيَقُولُ يَٰلَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَٰبِيَهْ ﴿٢٥﴾ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ ﴿٢٦﴾ يَٰلَيْتَهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيَةَ ﴿٢٧﴾

সে সময় যাকে তার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে,[১২] সে বলবে ঃ নাও, আমার আমলনামা পড়ে দেখো।[১৩] আমি জানতাম, আমাকে হিসেবের সম্মুখীন হতে হবে।[১৪] তাই সে মনের মত আরাম আয়েশের মধ্যে থাকবে। উন্নত মর্যাদার জান্নাতে। যার ফলের গুচ্ছসমূহ নাগালের সীমায় অবনমিত হয়ে থাকবে। (এসব লোকদেরকে বলা হবে ঃ) অতীত দিনগুলোতে তোমরা যা করে এসেছো তার বিনিময়ে তোমরা তৃপ্তির সাথে খাও এবং পান করো। আর যার আমলনামা তার বাঁ হাতে দেয়া হবে[১৫], সে বলবেঃ হায়! আমার আমলনামা যদি আমাকে আদৌ দেয়া না হতো[১৬] এবং আমার হিসেব যদি আমি আদৌ না জানতাম[১৭] তাহলে কতই না ভালো হতো। হায়! আমার সেই মৃত্যুই (যা দুনিয়াতে এসেছিলো) যদি চূড়ান্ত হতো।[১৮]

১২. ডান হাতে আমলনামা দেয়ার অর্থই হবে তার হিসেব–নিকেশ অত্যন্ত পরিষ্কার। আর সে আল্লাহ তা'আলার আদালতে অপরাধী হিসেবে নয়, বরং একজন সৎ ও সত্যনিষ্ঠ মানুষ হিসেবে উপস্থিত হতে যাচ্ছে। অধিকতর সম্ভাবনা হলো, আমলনামা দেয়ার সময়ই সৎ ও সত্যনিষ্ঠ মানুষগুলো নিজেরাই ডান হাত বাড়িয়ে আমলনামা গ্রহণ করবে। কারণ মৃত্যুর সময় থেকে হাশরের ময়দানে উপস্থিত হওয়ার সময় পর্যন্ত তার সাথে যে আচরণ করা হবে তাতে তার মনে এতটা আস্থা ও প্রশান্তি থাকবে যে, সে মনে করবে আমাকে এখানে পুরস্কার প্রদানের জন্য হাজির করা হচ্ছে, শাস্তিদানের জন্য নয়। একজন মানুষ সৎ ও সত্যনিষ্ঠ মানুষ হিসেবে পরপারে যাত্রা করছে, না অসৎ ও পাপী হিসেবে যাত্রা করছে মৃত্যুর সময় থেকেই তা তার কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়। একথাটি কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। তাছাড়া মৃত্যুর সময় থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত একজন নেক্‌কার মানুষের সাথে সম্মানিত মেহমানের মত আচরণ করা হয়। কিন্তু একজন অসৎ ও বদকার মানুষের সাথে আচরণ করা হয় অপরাধে অভিযুক্ত কয়েদীর মত। এরপর কিয়ামতের দিন আখেরাতের জীবনের সূচনালগ্ন থেকেই নেক্‌কার মানুষদের জীবন যাপনের ধরন–ধারণই পাল্টে যায়। একইভাবে কাফের, মুনাফিক ও

مَآ أَغْنَىٰ عَنِّى مَالِيَهْ ۜ ﴿٢٨﴾ هَلَكَ عَنِّى سُلْطَٰنِيَهْ ﴿٢٩﴾ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ﴿٣٠﴾ ثُمَّ
ٱلْجَحِيمَ صَلُّوهُ ﴿٣١﴾ ثُمَّ فِى سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَٱسْلُكُوهُ ﴿٣٢﴾ إِنَّهُۥ كَانَ
لَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ ٱلْعَظِيمِ ﴿٣٣﴾ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴿٣٤﴾ فَلَيْسَ لَهُ
ٱلْيَوْمَ هَٰهُنَا حَمِيمٌ ﴿٣٥﴾ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ ﴿٣٦﴾ لَّا يَأْكُلُهُۥٓ إِلَّا ٱلْخَٰطِـُٔونَ ﴿٣٧﴾

আজ আমার অর্থ–সম্পদ কোন কাজে আসলো না। আমার সব ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছে।[১৯] (আদেশ দেয়া হবে) পাকড়াও করো ওকে আর ওর গলায় বেড়ি পরিয়ে দাও। তারপর জাহান্নামে নিক্ষেপ করো। এবং সত্তর হাত লম্বা শিকল দিয়ে বেঁধে ফেলো। সে মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করতো না এবং দুস্থ মানুষকে খাদ্য দিতে উৎসাহিত করতো না।[২০] তাই আজকে এখানে তার সমব্যথী কোন বন্ধু নেই। আর কোন খাদ্যও নেই ক্ষত নিসৃত পুঁজ–রক্ত ছাড়া। যা পাপীরা ছাড়া আর কেউ খাবে না।

পাপীদের জীবন যাপনের ধরনও ভিন্ন রূপ হয়ে যায়। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আনফাল, আয়াত ৫০; আন নাহল, আয়াত ২৮ ও ৩২ এবং টীকা ২৬; বনী ইসরাঈল, আয়াত ৯৭; ত্বা–হা, আয়াত ১০২, ১০৩ ও ১২৪ থেকে ১২৬ এবং টীকা ৭৯, ৮০ ও ১০৭; আল আম্বিয়া, আয়াত ১০৩, টীকা ৯৮; আল ফুরকান, আয়াত ২৪ ও টীকা ৩৮; আন নাম্‌ল, আয়াত ৮৯ ও টীকা ১০৯; সাবা, আয়াত ৫১ ও টীকা ৭২; ইয়াসীন, আয়াত ২৬ ও ২৭ এবং টীকা ২২–৩২; আল মু'মিন, আয়াত ৪৫ ও ৪৬ এবং টীকা ৬৩; মুহাম্মাদ, আয়াত ২৭ এবং টীকা ৩৭; ক্বাফ, আয়াত ১৯ থেকে ২৩ পর্যন্ত এবং টীকা ২২, ২৩ ও ২৫)।

১৩. অর্থাৎ আমলনামা পাওয়ার সাথে সাথেই তারা আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠবে এবং নিজের বন্ধু–বান্ধবদের তা দেখাবে। সূরা ইনশিকাকের ৯ আয়াতে বলা হয়েছে যে, "সে আনন্দচিত্তে আপনজনদের কাছে ফিরে যাবে।"

১৪. অর্থাৎ তারা তাদের এ সৌভাগ্যের কারণ হিসেবে বলবে যে, দুনিয়ার জীবনে তারা আখেরাতকে ভুলে ছিল না। বরং একদিন তাদেরকে আল্লাহর সামনে হাজির হয়ে সব কৃতকর্মের হিসেব দিতে হবে এ বিশ্বাস নিয়েই তারা সেখানে জীবন যাপন করেছিল।

১৫. সূরা ইন্‌শিকাকে বলা হয়েছে, "আর যাকে পিছন দিক থেকে আমলনামা দেয়া হবে।" সম্ভবত তা হবে এভাবে, অপরাধীর প্রথম থেকেই তার অপরাধী হওয়ার বিষয়টি জানা থাকবে। তার আমলনামায় কি আছে তাও ঠিকঠাক তার জানা থাকবে। তাই সে অত্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাঁ হাত বাড়িয়ে তা গ্রহণ করবে এবং সংগে সংগেই নিজের পেছনের দিকে লুকিয়ে ফেলবে যাতে কেউ তা দেখতে না পায়।

فَلَآ أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ﴿٣٨﴾ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ ﴿٣٩﴾ إِنَّهُۥ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿٤٠﴾ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ۚ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ ﴿٤١﴾ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿٤٢﴾ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٤٣﴾

২ রুকূ'

অতএব তা নয়।[২১] আমি শপথ করছি ঐ সব জিনিসেরও যা তোমরা দেখতে পাও এবং ঐ সব জিনিসেরও যা তোমরা দেখতে পাও না। এটা একজন সম্মানিত রসূলের বাণী,[২২] কোন কবির কাব্য নয়। তোমরা খুব কমই ঈমান পোষণ করে থাকো[২৩] আর এটা কোন গণকের গণনাও নয়। তোমরা খুব কমই চিন্তা-ভাবনা করে থাকো। এ বাণী বিশ্ব-জাহানের রবের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত।[২৪]

১৬. অর্থাৎ হাশরের ময়দানে প্রকাশ্যে আমার হাতে এ আমলনামা দিয়ে সবার সামনে লাঞ্ছিত ও অপমানিত না করে যে শাস্তি দেয়ার তা দিয়ে ফেললেই ভালো হতো।

১৭. অর্থাৎ পৃথিবীতে আমি যা করে এসেছি তা যদি আমাকে আদৌ বলা না হতো। এ আয়াতের আরেকটি অর্থ এও হতে পারে যে, আমি ইতিপূর্বে আদৌ জানতাম না যে, হিসেব কি জিনিস। কোনদিন আমার কল্পনায়ও আসেনি যে, আমাকে একদিন আমার কার্যাবলীর হিসেব দিতে হবে এবং আমার অতীত কাজ-কর্ম সব আমার সামনে পেশ করা হবে।

১৮. অর্থাৎ দুনিয়ার জীবনে আমার মৃত্যুবরণের পর সবকিছু যদি নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতো। এবং আর কোন জীবন যদি না থাকতো।

১৯. মূল আয়াতে আছে هَلَكَ عَنِّي سُلْطَٰنِيَهْ । سلطان শব্দটি দলিল-প্রমাণ অর্থেও ব্যবহৃত হয় আবার ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্থেও ব্যবহৃত হয়। দলিল-প্রমাণ অর্থে গ্রহণ করলে তার অর্থ হবে আমি দলিল ও যুক্তি-প্রমাণের যে তুবড়ি ছুটাতাম তা আর এখানে চলবে না। এখন আত্মপক্ষ সমর্থনের মত কোন প্রমাণই আমার কাছে নেই। আর ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও প্রভাব প্রতিপত্তি অর্থে গ্রহণ করলে তার অর্থ হবে, আমি যে শক্তিতে বলিয়ান হয়ে পৃথিবীতে বুকটান করে চলতাম তা খতম হয়ে গিয়েছে। এখানে আমার কোন দলবল বা সেনাবাহিনী নেই, আমার আদেশ মেনে চলারও কেউ নেই। এখানে তো আমি এমন একজন অসহায় মানুষের মত দাঁড়িয়ে আছি যে আত্মরক্ষার জন্যও কিছু করতে সক্ষম নয়।

২০. অর্থাৎ নিজে কোন দরিদ্রকে খাবার দেয়া তো দূরের কথা কাউকে এতটুকু কথা বলাও পছন্দ করতো না যে, আল্লাহর ক্ষুধাক্লিষ্ট বান্দাদের খাদ্য দান করো।

২১. অর্থাৎ তোমরা যা মনে করে নিয়েছো ব্যাপার তা নয়।

২২. এখানে সম্মানিত রসূল মানে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। কিন্তু সূরা তাক্‌বীরে (আয়াত ১৯) সম্মানিত রসূলের যে উল্লেখ আছে তার অর্থ হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম। এখানে যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেই সম্মানিত রসূল বলা হয়েছে তার প্রমাণ হলো, কুরআনকে সম্মানিত রসূলের বাণী বলার পরেই বলা হয়েছে যে, তা কোন কবি বা গণকের কথা নয়। আর একথা সবারই জানা যে, মক্কার কাফেররা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেই কবি বা গণক বলতো। তারা জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে কবি বা গণক বলতো না। পক্ষান্তরে সূরা তাক্‌বীরে কুরআন মজীদকে সম্মানিত রসূলের বাণী বলার পরে বলা হয়েছে যে, সে রসূল অত্যন্ত শক্তিশালী, আরশের অধিপতির কাছে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী, সেখানে তাঁর কথা গ্রহণ করা হয়, তিনি বিশ্বস্ত ও আমানতদার এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে পরিষ্কার দিগন্তে দেখেছেন। সূরা নাজ্‌মের ৫ থেকে ১০ আয়াতে জিবরাঈল আলাইহিস সাল্লাম সম্পর্কে প্রায় এ একই বিষয় বর্ণিত হয়েছে।

এখানে একটি প্রশ্ন জাগে। তাহলো, কুরআনকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও জিবরাঈল আলাইহিস সালামের বাণী বলার তাৎপর্য কি? এর জওয়াব হলো, মানুষ কুরআনের এ বাণী শুনতো রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ থেকে এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুনতেন জিবরাঈল আলাইহিস সালামের মুখ থেকে। তাই এক বিচারে এটা ছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী এবং আরেক বিচারে তা ছিল হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালামের বাণী। কিন্তু পরক্ষণেই বিষয়টি স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে এ হচ্ছে সমগ্র বিশ্ব–জাহানের 'রবের' নাযিলকৃত বাণী। তবে তা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিবরাঈলের মুখ থেকে এবং লোকদেরকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ থেকে শুনানো হচ্ছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজের কথা থেকেও এ সত্যটিই ফুটে ওঠে। তিনি বলেছেন যে, এসব তাঁদের দু'জনের কথা নয়। বরং বার্তাবাহক হিসেবে তাঁরা এ বাণী মূল বাণী প্রেরকের পক্ষ থেকে পেশ করেছেন।

২৩. "কমই ঈমান পোষণ করে থাকো" প্রচলিত আরবী বাকরীতি অনুসারে এর একটি অর্থ হতে পারে তোমরা আদৌ ঈমান পোষণ করো না। এর আরেকটি অর্থ এও হতে পারে যে, কুরআন শুনে কোন সময় তোমাদের মন হয়তো স্বতস্ফূর্তভাবেই বলে ওঠে যে, এটা মানুষের কথা হতে পারে না। কিন্তু তোমরা নিজেদের হঠকারিতার ওপর অবিচল রয়েছ এবং এ বাণীর ওপর ঈমান আনতে অস্বীকৃতি জানিয়ে থাকো।

২৪. সারকথা হলো তোমরা যা কিছু দেখতে পাও এবং যা কিছু দেখতে পাও না তার কসম আমি এ জন্য করছি যে, এ কুরআন কোন কবি বা গণকের কথা নয়। বরং সারা বিশ্ব–জাহানের রবের নাযিলকৃত বাণী। এ বাণী এমন এক রসূলের মুখ থেকে উচ্চারিত হচ্ছে যিনি মর্যাদাবান (অত্যন্ত সম্মানিত ও ভদ্র)। এখন দেখা যাক কসম করার উদ্দেশ্য কি? লোকজন যা কিছু দেখতে পাচ্ছিল তাহলো ঃ

এক ঃ এ বাণী এমন ব্যক্তি পেশ করছিলেন যার মার্জিত ও ভদ্র স্বভাবের বিষয়টি মক্কা শহরের কারোই অজানা ছিল না। সমাজের সবাই একথা জানতো যে, নৈতিক চরিত্রের দিক দিয়ে তিনি তাদের জাতির মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি। এরূপ লোক আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা

আরোপ করবে এবং নিজে কোন কথা বানিয়ে মহান আল্লাহর কথা বলে তা চালিয়ে দেবে, এত বড় মিথ্যার বেসাতি এ লোকের কাছ থেকে আশা করা যায় না।

দুই ঃ তারা আরো দেখছিল যে, এ ব্যক্তি কোন ব্যক্তিগত স্বার্থের বশবর্তী হয়ে এ বাণী পেশ করছে না। বরং এ কাজ করতে গিয়ে সে নিজের স্বার্থকেই জলাঞ্জলী দিয়েছে। এ কাজ করতে গিয়ে সে নিজের ব্যবসায়–বাণিজ্য ধ্বংস করেছে, আরাম–আয়েশ ত্যাগ করেছে, যে সমাজে তাকে অভাবনীয় সম্মান দেখানো হতো সেখানেই তাকে গালিগালাজের সম্মুখীন হতে হচ্ছে, আর এসব করে নিজেই যে শুধু দুঃখ–মসিবতের মধ্যে নিপতিত হচ্ছে তাই নয়, বরং নিজের ছেলেমেয়েদেরকেও সব রকম দুঃখ–দুর্দশার মুখে ঠেলে দিয়েছে। ব্যক্তি স্বার্থের পূজারী হলে সে নিজেকে এ দুঃখ–দুর্দশার মধ্যে টেনে আনবে কেন?

তিন ঃ তারা নিজের চোখে এও দেখছিলো যে, তাদের সমাজের যেসব লোক ঐ ব্যক্তির প্রতি ঈমান আনছিলো তাদের জীবনে হঠাৎ একটা বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়ে যাচ্ছে। কোন কবি অথবা গণকের কথার এতটা প্রভাব কি কখনো দেখা গিয়েছে যে তা মানুষের মধ্যে ব্যাপক নৈতিক পরিবর্তন এনে দিয়েছে আর তার অনুসারীরা এ জন্য সব রকমের বিপদাপদ ও দুঃখ–কষ্ট বরদাশত করতে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছে?

চার ঃ কবিদের ভাষা কেমন হয়ে থাকে এবং গণকদের কথাবার্তা কিরূপ হয় তাও তাদের অজানা ছিল না। কুরআনের ভাষা, সাহিত্য ও বিষয়বস্তুকে কবির কাব্য এবং গণকের গণনা সদৃশ বলা একমাত্র হঠকারী ব্যক্তি ছাড়া আর কারো পক্ষে সম্ভব ছিল না। (আমি এ বিষয়ে তাফহীমুল কুরআনের সূরা আম্বিয়ার ৭নং টীকায়, সূরা শু'আরার ১৪২ থেকে ১৪৫নং টীকায় এবং সূরা আত্ তূরের ২২নং টীকায় বিস্তারিত আলোচনা করেছি।)

পাঁচ ঃ সমগ্র আরব ভূমিতে উন্নত ভাষাশৈলীর অধিকারী এমন কোন ব্যক্তি ছিল না যার চমকপ্রদ ও অলংকারময় ভাষাকে কুরআনের মোকাবিলায় পেশ করা যেতো। কুরআনের সমকক্ষ হওয়া তো দূরের কথা, কারো ভাষার বিশুদ্ধতা ও শ্রুতিমাধুর্য কুরআনের উন্নত ভাষাশৈলীর ধারে কাছে ঘেঁষারও যোগ্যতা রাখতো না। এ বিষয়টিও তাদের জানা ছিল।

ছয় ঃ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজের কথাবার্তা ও ভাষার সাহিত্যিক উৎকর্ষ ও কুরআনের সাহিত্যিক মান ও উৎকর্ষ থেকে যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল তাও তাদের অগোচরে ছিল না। আরবী ভাষাভাষী কোন ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বক্তৃতা এবং কুরআন শোনার পর বলতে পারতো না যে, এ দু'টি একই ব্যক্তির মুখের কথা।

সাত ঃ যেসব বিষয়বস্তু ও জ্ঞান–বিজ্ঞান কুরআনে পেশ করা হয়েছে নবুওয়াত দাবী করার একদিন আগেও মক্কার লোকেরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ থেকে তা শোনেনি। তারা এও জানতো যে, তাঁর কাছে এসব তথ্য ও বিষয়বস্তু জানার কোন উপায়–উপকরণও নেই। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন গোপনীয় সূত্র থেকে এসব তথ্য ও জ্ঞান লাভ করছেন বলে তাঁর বিরোধীরা তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করলেও মক্কার কেউ–ই তা বিশ্বাস করতো না। (আমি তাফহীমুল কুরআনের সূরা

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ﴿٤٤﴾ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ﴿٤٥﴾ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ﴿٤٦﴾ فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ﴿٤٧﴾ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٤٨﴾ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ ﴿٤٩﴾ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٥٠﴾ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ ﴿٥١﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٥٢﴾

যদি এ নবী নিজে কোন কথা বানিয়ে আমার কথা বলে চালিয়ে দিতো তাহলে আমি তার ডান হাত ধরে ফেলতাম এবং ঘাড়ের রগ কেটে দিতাম। তোমাদের কেউ–ই (আমাকে) এ কাজ থেকে বিরত রাখতে পারতো না।[২৫] আসলে এটি আল্লাহভীরু লোকদের জন্য একটি নসীহত।[২৬] আমি জানি তোমাদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক লোক মিথ্যাপ্রতিপন্ন করতে থাকবে। নিশ্চিতভাবে তা এসব কাফেরদের জন্য অনুতাপ ও আফসোসের[২৭] কারণ হবে। এটি অবশ্যই এক নিশ্চিত সত্য। অতএব হে নবী, তুমি তোমার মহান রবের পবিত্রতা ঘোষণা করো।

আন নাহ্‌লের ১০৭নং টীকা এবং সূরা আল ফুরকানের ১২নং টীকায় এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা পেশ করেছি।)

আট ঃ এ পৃথিবী থেকে সুদূর আসমান তথা মহাশূন্য পর্যন্ত বিস্তৃত এ বিরাট–বিশাল বিশ্ব–জাহানকে তারা নিজ চোখে সুচারু রূপে পরিচালিত হতে দেখছিল। তারা এও দেখছিলো যে, এ বিশাল বিশ্বলোক একটি জ্ঞানগর্ভ আইন–বিধান এবং সর্বব্যাপী নিয়ম–শৃংখলা দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। আরবের লোকেরা শির্‌কে লিপ্ত ছিল এবং আখেরাত অস্বীকার করতো। এটা ছিল তাদের আকীদা–বিশ্বাসের অন্তর্গত। কিন্তু এ বিশাল বিশ্বলোকের পরিচালনা ও নিয়ম–শৃংখলার কোন ক্ষেত্রেই তারা শির্‌ক ও আখেরাত অস্বীকৃতির পক্ষে কোন সাক্ষ–প্রমাণ খুঁজে পেতো না। বরং কুরআন তাওহীদ ও আখেরাতের যে ধারণা পেশ করছে সর্বত্র তারই সত্যতার সাক্ষ–প্রমাণ পাওয়া যায়।

এসবই তারা দেখতে পাচ্ছিল। কিন্তু যেসব জিনিস তারা দেখতে পাচ্ছিল না তা হলো, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলাই এ বিশ্ব–জাহানের স্রষ্টা, মালিক এবং শাসক, বিশ্ব–জাহানের সবাই তাঁর বান্দা, একমাত্র তিনি ছাড়া আর কেউ ইলাহ নয়, কিয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হবে, আল্লাহ তা'আলাই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রসূল করে পাঠিয়েছেন এবং আল্লাহর পক্ষ থেকেই তাঁর ওপর কুরআন নাযিল হচ্ছে। পূর্বোক্ত আয়াতগুলোতে যা বলা হয়েছে তা বলা হয়েছে এ দু' ধরনের সত্যের কসম খেয়ে।

২৫. নিজের পক্ষ থেকে অহীর মধ্যে কোন কম বেশী করার ইখতিয়ার নবীর নেই, নবী যদি এ কাজ করে তাহলে আমি তাকে কঠিন শাস্তি দেবো, একথাটি বলাই এ

আয়াতের মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু কথাটি বলতে যে বাচনভঙ্গী গ্রহণ করা হয়েছে তাতে চোখের সামনে এমন একটি চিত্র ভেসে ওঠে যে, বাদশাহর নিযুক্ত কর্মচারী বাদশাহর নামে জালিয়াতি করলে তিনি তাকে পাকড়াও করে তার গর্দান মেরে দেবেন। কিছু লোক এ আয়াত থেকে এ ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, কোন ব্যক্তি নবুওয়াতের দাবী করলে তৎক্ষণাৎ আল্লাহর তরফ থেকে যদি তার গর্দানের রগ কেটে দেয়া না হয় তাহলে এটা হবে তার নবী হওয়ার প্রমাণ। অথচ এ আয়াতে যা বলা হয়েছে তা সত্য নবী সম্পর্কে বলা হয়েছে। নবুওয়াতের মিথ্যা দাবীদার সম্পর্কে তা প্রযোজ্য নয়। মিথ্যা দাবীদার তো শুধু নবুওয়াতের দাবীই করে না, খোদায়ীর দাবী পর্যন্ত করে বসে এবং দীর্ঘদিন পর্যন্ত পৃথিবীতে বুক ফুলিয়ে চলে। এটা তাদের সত্য হওয়ার কোন প্রমাণ নয়। (আমি তাফহীমুল কুরআনের সূরা ইউনুসের ২৩নং টীকায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।)

২৬. অর্থাৎ যারা ভুল-ভ্রান্তি ও তার খারাপ পরিণাম থেকে রক্ষা পেতে চায় কুরআন তাদের জন্য উপদেশ বাণী। (আরো বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল বাকারাহ, টীকা ৩)

২৭. অর্থাৎ পরিশেষে তাদেরকে এ জন্য অনুশোচনা করতে হবে যে, কেন তারা কুরআনকে মিথ্যা মনে করেছিল।